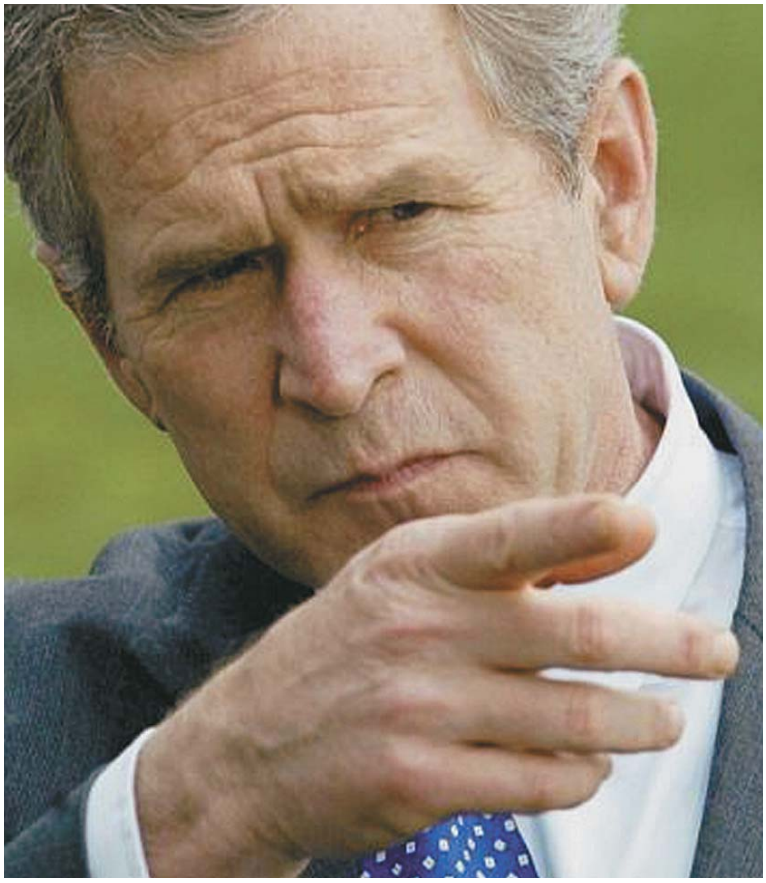

বুশ

মাস্তান নম্বর ওয়ান

আমেরিকা যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন, অপরাধীদের নির্বাসন দেয়া হত সেখানে। কয়েদি আর সন্ত্রাসীদের হাত ধরেই শ্বেতাঙ্গরা বসতি গড়েছিল আমেরিকায়। আজকে বুশের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণ ইতিহাস নিহিত। বুশ যেন এক নব্য ম্যাকার্থি, কমিউনিস্টদের পরিবর্তে মুসলমান নিধন করছেন। তার সন্ত্রাসী বাহিনী যেখানেই যাচ্ছে, সেখানেই তৈরি হচ্ছে অরাজকতা। বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় বুশ-বাহিনীর স্নেহধন্যরা লুটপাট চালাচ্ছে। তেলের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আক্রমণ করে বুশ নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাস্তান হিসেবে পরিচিত করেছেন...

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর মাস ছয়েক আগে সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ক্যাম্প ডেভিডে অবকাশ যাপন করছিলেন। এ সময় তার হাতে একটা বই আসে। 'ইস্টওয়ার্ড টু টারটারি' নামের বইটি একটি রাজনৈতিক ভ্রমণকাহিনী। সেখানে রোমানিয়া এবং বুলগেরিয়া থেকে তেলসমৃদ্ধ কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নানারকম রাজনৈতিক সমস্যা যেমন কাস্পিয়ান পাইপলাইনকে নিয়ে সংঘাত, ইরান-আজারবাইজান যুদ্ধ, সিরিয়ার সংকট, জর্জিয়ার নৈরাজ্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বইটি বিশ্বের প্রতি বুশের দৃষ্টিভঙ্গিতে এতোটাই ছাপ ফেলে যে তিনি এর লেখক রবার্ট কাপলানকে হোয়াইট হাউজে ডেকে পাঠান। কিন্তু কোন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বুশ বইটি পড়ে? কাপলান লিখেছেন, 'মানবজমিন বড়ই কঠিন। কিন্তু ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে বৃহৎ শক্তিগুলো এই ভয়ানক ভূভাগের মোকাবেলা করেছে। লক্ষ্য অর্জনে পিছপা হয়নি।' বৃহৎ শক্তিগুলোর মোকাবেলার ধরন সম্পর্কে কাপলানের অভিমত, 'এর নেতারা জানতেন ঠিক কখন হস্তক্ষেপ করতে হবে। এবং কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই তারা তা করতেন।'

বুশও ঠিক তাই করছেন। বৃহৎ শক্তি হিসেবে আমেরিকার দম্ভ এবং ক্ষমতা বোঝাতে গিয়ে তিনি অন্যায়ভাবে শক্তি প্রদর্শন করছেন। পরিণতিতে বুশ প্রতিষ্ঠিত হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হিসেবে।

ইরাকে অন্যায় আগ্রাসন শুরুর অল্প কিছুদিন আগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশ্বের সবগুলো মার্কিন দূতাবাসকে নির্দেশ দেয়, দেশে দেশে প্রেসিডেন্ট বুশের ভাবমূর্তি কি তা জানানোর। দূতাবাসগুলো যথাসময়ে রিপোর্ট পাঠায়। চমকে ওঠে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা। দেখা যায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ বুশকে 'খলনায়ক' মনে করে। সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে বুশকেই সবাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে। রিপোর্ট দেখে এক পদস্থ মার্কিন কর্মকর্তার মন্তব্য ছিলো 'এটি আশ্চর্যজনক। হুসেন (সাদ্দাম) যে একটা সমস্যা এখানে তার কোনো উল্লেখই নেই'। আগ্রাসী জোটের শরিক এক দেশ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানায়, দেশটির জনসাধারণ বুশকে 'শত্রু' মনে করে।

সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইরাকে অন্যায় আগ্রাসন চালিয়ে বুশ আবারো প্রমাণ করলেন, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তিনি সত্যিই চরম হুমকি। মাস্তানরা যেমন একটি দেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, বুশও তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছেন। এ জন্য তাকে 'আন্তর্জাতিক মাস্তান' খেতাব দেয়া যেতে পারে। বুশের নির্বাচনী এলাকা টেক্সাস। আমেরিকায় সাদা চামড়ার মানুষেরা যখন বসতি বিস্তার করছিলো, তখন এসব অঞ্চলে খনিজ সম্পদ আর গবাদিপশু নিয়ে বন্দুকযুদ্ধ ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 'কাউবয়' প্রেসিডেন্ট বুশ সেই ঐতিহ্য যেন বহন করে চলেছেন। বন্দুকবাজির মাধ্যমে বিশ্বের সম্পদশালী দেশগুলোর সম্পদ কেড়ে নিচ্ছেন। তার 'মাস্তানিতে' বিশ্বের দুর্বল দেশগুলো আজ দিশেহারা। অনেকে বলছেন, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বুশ পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য। বুশ সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন।

পঁচিশ বছর আগে ১৯৭৬ সালের ৬ অক্টোবর কিউবা শিকার হয় এক কুখ্যাত আক্রমণের। কিউবার এয়ারলাইন্সের একটি বিমান স্যাবোটাজ করে বার্বাডোজের উপকূলে মধ্যআকাশে উড়িয়ে দেয়া হয়। ৭৩ জন যাত্রীর সবাই নিহত হয়। যাদের মধ্যে ছিলেন সেন্ট্রাল আমেরিকান এবং ক্যারিবিয়ান ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ বিজয়ীদের তরুণ দলটি। কিন্তু এই ঘৃণ্য অপরাধের বিচার যুক্তরাষ্ট্র কখনোই করেনি। সিআইএ'র হাতে তৈরি এই কালপ্রিটদের সবাইকে মার্কিন প্রশাসন চিনতো। এদের একজন অরল্যান্ডো বচ, একজন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল যাকে বলেছিলেন 'অনুশোচনাহীন সন্ত্রাসী।' কিন্তু

বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ বুশকে 'খলনায়ক' মনে করে। সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে বুশকেই সবাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে

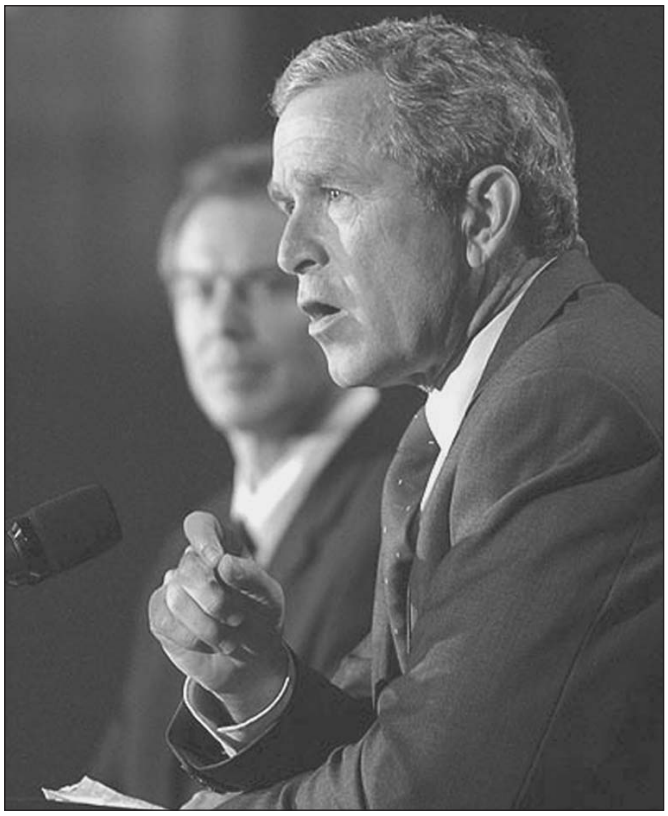

এই সন্ত্রাসীকে রক্ষা করেন প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা সিনিয়র বুশ। একই ঘটনা ঘটেছিলো লকারবি বিমান বিস্ফোরণে। অথচ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফির কাঁধে সমস্ত দায় চাপিয়ে তার প্রাসাদে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। হত্যা করা হয় গাদ্দাফির পালিত শিশু কন্যাকে।

বুশের ভাই জেব বুশও কম যান না। বচ্‌কে আশ্রয় দেয়া হয়েছিলো ফ্লোরিডাতেই, জেব বুশের নির্বাচনী এলাকায়। অবশ্য জেব তখনও গভর্নর হননি। কিন্তু গভর্নর হবার পর জেব বচ্‌ের উকিল রাউল কেনটেরোকে ফ্লোরিডার স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় রাশিয়ার প্রভাবশালী সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইমস পত্রিকার 'বুশ-বচ্‌-কেনটেরো কানেকশন' নামে এক সম্পাদকীয়তে জেব বুশকে সতর্ক করে দেয়া হয়। যেন বচ্‌ের মতো একজন সন্ত্রাসীর ঘনিষ্ঠজনকে ফ্লোরিডার সর্বোচ্চ আদালতে বসানো না হয়। এমন উদাহরণ আরো আছে। জেব বুশ আশ্রয় দিয়েছেন সালভাদরের দুই সন্ত্রাসী যমজকে। কয়েক হাজার সালভাদরিয়ান হত্যার পাশাপাশি ৬ জন আমেরিকান নান হত্যার অভিযোগও আছে তাদের বিরুদ্ধে। সালভাদর থেকে তাদের বহিষ্কারের পর জেব বুশ তার নিজের রাজ্যে এই সন্ত্রাসী ভাই দুটোকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। এছাড়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপি করে ৫৩৭ ভোটে বুশকে জিতিয়ে দেয়ার অভিযোগও আছে জেব বুশের বিরুদ্ধে।

প্রেসিডেন্ট বুশের ট্র্যাক রেকর্ডও পিতা আর ভাইয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম না। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হওয়া জুনিয়র বুশ ছিলেন 'প্লেবয়'। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এলকোহল আর ড্রাগ ছিলো তার সঙ্গী। তেলের ব্যবসায় জালিয়াতি করে একসময় মিলিয়ন ডলার কামিয়েছেন। বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ছিলেন সিআইএ প্রধান। বুশ দেখেছেন পিতাকে ল্যাটিন আমেরিকার ড্রাগ মাফিয়া আর সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে। '৮০-র দশকে এসব ড্রাগ মাফিয়ারা সিআইএর সহায়তায় নিকারাগুরায় সংকট সৃষ্টি করেছিলো। এছাড়া সিনিয়র বুশ তার শাসনামলে পানামা আর ইরাকে যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশও টেক্সাসের গভর্নর থাকাকালে ১৩০ জন কয়েদির মৃত্যুদন্ড দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হবার পর বুশ তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, আগেভাগে আক্রমণনীতি এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দু'দুটো যুদ্ধ করে সবচেয়ে যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্টের খেতাব পেয়েছেন।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শৌর্যে বীর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত হয়। ইউরোপ তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। তাদের অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে। পৃথিবী জুড়ে উন্মেষ ঘটছে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের। ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হবার অবারিত সুযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের সামনে। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তখন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। বরং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৫-এ এই লক্ষ্যে চার্চিল এবং স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তেহরান থেকে ইয়াল্টা পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক পৃথিবী সফর করেছেন। রুজভেল্ট ছিলেন অসুস্থ। কোমরের নিচ থেকে প্যারালাইজড ছিলো। পায়ে লাগানো ছিলো ১০ পাউন্ড ওজনের স্টিল ব্রেস। নৌ এবং আকাশপথে ৪০ ঘন্টার ভ্রমণে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার দশা হয়েছিলো। অথচ এ কাজটি করার মতো তার প্রশাসনে মার্শাল, আইজেনহাওয়ারের মতো সহকারীর অভাব ছিলো না। কিন্তু রুজভেল্ট তা করেননি। তিনি নমনীয়তা দেখিয়েছেন। চীন এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে বিধায় সে সময় কৃষিভিত্তিক দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে এসেছেন। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। মার্শাল প্ল্যানের আওতায় আজকের মূল্যে ১২ হাজার কোটি ডলার সাহায্য প্রদান করেছেন ইউরোপকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার এবং শত্রু বাড়ানোর পরিবর্তে রুজভেল্ট বিনয় এবং বন্ধুত্বের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বুশ করছেন ঠিক তার উল্টোটা। সভ্যতা ও মার্জিত আচরণের বদলে তিনি বেত হাতে পৃথিবী শাসনের ভার নিয়েছেন। পৃথিবী শাসনের ভার তাকে কেউ দেয়নি। কিন্তু মার্কিন শক্তিতে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে, তেল ও অস্ত্র লবির প্ররোচনায় এবং উগ্রবাদী খ্রিস্টানদের কুবুদ্ধিতে প্রেসিডেন্ট বুশ সেই পথেই হাঁটছেন। বুশের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ একজন মার্কিন সিনেটর লিখেছেন, 'ভালো রাজনীতিকদের বিনয় থাকে। বুশ এবং রামসফেল্ড কারোরই এটা নেই।' ক্লিনটন প্রশাসনের সময় বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিলো। বসনিয়া, কসোভো, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলের সংঘাত নিরসনে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছিলো সর্বমহলে। এমনকি সার্বিয়াকে নিরস্ত্র করতে ন্যাটোর ছত্রছায়ায় যুক্তরাষ্ট্র বিমান হামলা চালালেও চীন ও রাশিয়া ছাড়া খুব বেশি বিরোধিতায় ক্লিনটন প্রশাসনকে পড়তে হয়নি। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার যে ধারা ক্লিনটন প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন, বুশ ক্ষমতায় এসে তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিংবা বলা যায়, ধরে রাখতে চাননি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বুশকে আনাড়ি বলা চলে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ সংকীর্ণ, রিপাবলিকানদের মধ্যে যেমনটা সচরাচর দেখা যায়। তার জ্ঞানেও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি

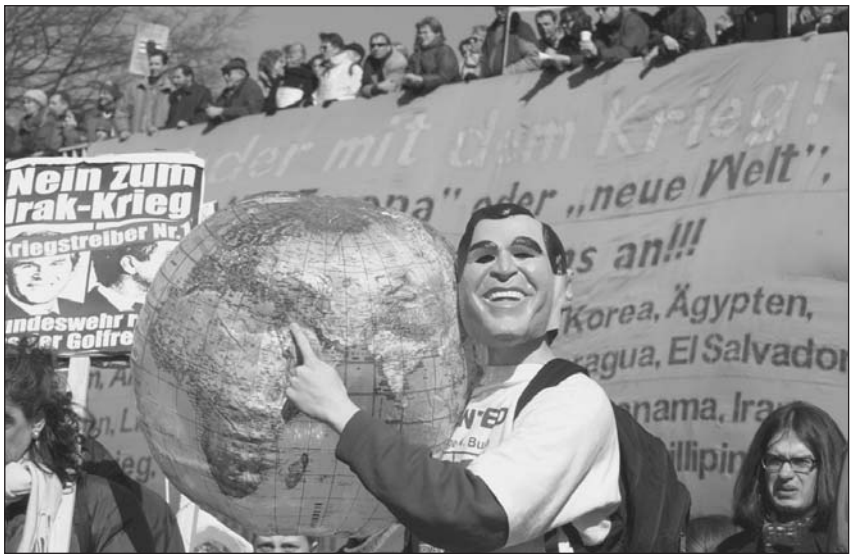

কুর্দি ও শিয়াদের হত্যার জন্য সাদ্দামের বিচার করেছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। কিন্তু শাবরা-শাতিলায় নিরীহ প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুকে হত্যার খলনায়ক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারনকে অভিহিত করেছেন 'শান্তিবাদী মানুষ' হিসেবে

চলাকালে একবার এক টিভি অনুষ্ঠানে তাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। বুশ বলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিলো, সম্ভাব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সরকার প্রধানের নাম কেন জানেন না? ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্র বুশ কেবল ব্যবসাটাই বোঝেন। বিশ্বব্যাপী মার্কিন ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে আগ্রাসন চালাতেও তিনি পিছপা হন না। এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই তাকে পরিণত করেছে আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্তে।

১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার পর ইউরোপে একটা জরিপ চালানো হয়েছিলো। দেখা গেল, প্রায় ৫০ শতাংশ ইউরোপিয়ান মনে করে, বিশ্বব্যাপী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার কারণেই এই হামলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিলো, মার্কিন প্রশাসনের নীতি নির্ধারকরা হয়তো বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা দিলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এবং এই ডকট্রিনকেই তিনি কাজে লাগালেন বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের হাতিয়ার হিসেবে। টুইন টাওয়ার ট্রাজেডির পর বুশ বললেন, 'হয় আমাদের পক্ষে আসো, নয়তো সন্ত্রাসীদের পক্ষে যাও।' টুইন টাওয়ারের হামলার দায়ে আক্রমণ করলেন আফগানিস্তান বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই। সে সময় অনেকেই জানতেন, বুশের এই আক্রমণ অন্যায়। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মার্কিনিদের প্রতি সহানুভূতির কারণেই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বুশের অন্যায় যুদ্ধে নীরব ছিলেন। ফলে প্রেসিডেন্ট বুশ গর্বভরে বলতে পেরেছিলেন 'সারা বিশ্ব আমাদের সঙ্গে আছে।' আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ক্রমেই অশ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠা আত্মবিশ্বাসী বুশ ঘোষণা করলেন আগেভাগে আক্রমণের নীতি (Policy of pre-emptive attack)। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র কোনো দেশকে 'সন্ত্রাসী' কাজ সম্পাদনের আগেই আক্রমণ করবে। পৃথিবীতে এই নীতি অনুসরণ করে কেবল একটি দেশ ইসরাইল। '৬৭তে মিসর এবং '৮১তে ইরাক আক্রমণ এই নীতির প্রতিফলন। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন বুশের আগবাড়িয়ে আক্রমণের নীতির বাস্তবায়ন। প্রেসিডেন্ট বুশ বারবার বলেছেন, 'সাদ্দাম হোসেন ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।' অথচ বিশ্ববাসী জানে বাগদাদ ওয়াশিংটনকে কখনো হুমকি দেয়নি বা দেয়ার সামর্থ্যও রাখে না। জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরাক সংকটের সমাধানের যে দাবি বিশ্বের সব দেশ তুলেছিলো, তাকে তোয়াক্কা না করে বুশ ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছেন। বিশ্বসম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের অন্যায় আবদার অন্যান্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার নীতি গ্রহণ করে বুশ পরিণত হয়েছেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীতে।

১৭৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করা যুক্তরাষ্ট্র তার অসাম্রাজ্যবাদী মূলনীতিকে

পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি করেছিলো। থমাস জেফারসন বলেছিলেন, আমেরিকা অন্য জাতির ওপর শাসন তো করবেই না, অন্য দেশের ব্যাপারে নাকও গলাবে না। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে দেশে দেশে সরকার পরিবর্তন বা পুতুল সরকার বসানোর খেলায় মাতলেও সত্যিকার অর্থে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠেনি কখনো। ১৯৪৫ সালে জাপান ও জার্মানি দখলের সুযোগ পেলেও গ্রিক, রোমান বা ব্রিটিশদের মতো প্রথাগত সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠেনি। প্রেসিডেন্ট জন কুইন্স এডামস বলেছিলেন, 'আমেরিকা ধ্বংস করার জন্য শত্রু খুঁজতে বিদেশে যাবে না।' কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ ঠিক এই কাজটিই করছেন। সন্ত্রাসী আল-কায়েদা, ওসামা-বিন-লাদেন, সাদ্দাম হোসেন এরকম বহু ছায়াশত্রুকে ধ্বংসের নামে গোটা বিশ্বকেই অশান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

সন্ত্রাসীর সঙ্গে সম্পদের একটা যোগসূত্র আছে। বিশ্বব্যাপী প্রেসিডেন্ট বুশের এই সন্ত্রাসী অপতৎরতার পেছনে কাজ করছে তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। প্রেসিডেন্ট বুশের প্রশাসন তেল ও অস্ত্র লবির শক্ত ঘাঁটি। সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানে যুদ্ধ হলেও বিশ্ব জানে এই যুদ্ধের প্রধান কারণ তেল। মধ্য এশিয়ার বিপুল তেল সম্পদ করায়ত্ত এবং আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে পাইপ লাইন বসিয়ে তেল পরিবহন নিশ্চিত করার জন্যই বুশের প্রয়োজন পড়ে তালেবানদের উৎখাতের।

আজকে ইরাকে যে আগ্রাসন চলছে তার লক্ষ্যও তেল। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল মজুদের দেশটি দখল করে সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্টাইলে অস্ত্র ব্যবসায়ী গারনারকে ভাইসরয় হিসেবে বসানোর নীলনকশা চূড়ান্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সাদ্দামের গণবিধ্বংসী অস্ত্র সংক্রান্ত যেসব কথাবার্তা বুশ ও তার প্রশাসন বলছে, তা যে কেবল সত্যের অপলাপ সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হচ্ছে না। শুধু বুশ নয়, প্রশাসনের অন্য পদস্থরাও তার মতোই যুদ্ধংদেহি মনমানসিকতা ধারণ করছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড শিকাগোর এককালের কুখ্যাত দাঙ্গাবাজ অ্যাল ক্যাপোনের উদ্ধৃতি দেন : 'কেবল নরম কথার চেয়ে নরম কথা ও বন্দুক হাতে তুমি অনেক বেশি কিছু পেতে পার।' সন্ত্রাসী ক্যাপোনের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন প্রেসিডেন্ট বুশ।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, আফগানিস্তানে তালেবানদের কিংবা ইরাকে সাদ্দামকে তৈরি করেছিল আমেরিকা নিজেই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রচুর অর্থ আর অস্ত্র তালেবানদের যুগিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ইরাককে কূটনৈতিক সমর্থন এবং বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট বুশ আজকে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু নিজেও যে এ ধরনের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরিতে হাজার হাজার ডলার বিনিয়োগ করছেন সে কথা বলছেন না।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দামবিরোধী ছয়টি ইরাকি দলকে প্রায় ৪৬ কোটি টাকা সাহায্য করেছেন যেন তারা নিজেদের সশস্ত্র করতে পারে। এরকম একটি সংগঠন ইরানভিত্তিক এসসিআইআরআই(SCIRI)। সাদ্দামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর জন্য বুশ প্রশাসন এই গ্রুপকেও অর্থ যুগিয়েছে। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য একটি সন্ত্রাসী

সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইরাকে অন্যায় আগ্রাসন চালিয়ে বুশ আবারো প্রমাণ করলেন, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তিনি চরম হুমকি। মাস্তানরা যেমন একটি দেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, বুশও তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছেন। এ জন্য তাকে 'আন্তর্জাতিক মাস্তান' খেতাব দেয়া যেতে পারে

গ্রুপকে অর্থ যোগান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পড়ে। বুশ নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাননি। উপরন্তু তিনি নিজেই ইরানকে 'অশুভ চক্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবেই অর্থ ও অস্ত্র যুগিয়ে তালেবানদের তৈরি করা হয়েছিল। বুশ একদিকে তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, অন্যদিকে নতুন তালেবান সৃষ্টি করছেন। বিশ্বব্যাপী নিজের সন্ত্রাসী অপতৎপরতা অব্যাহত রাখতে বুশের শত্রু প্রয়োজন। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে তিনি অন্য একটি দেশ দখল করতে পারবেন।

বিশ্বের মধ্যে যে দেশটি অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তার নাম ইসরাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই দেশটির সমর্থক। '৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্র ৯১০০ কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষমতায় আসার পর এই সাহায্য আরো বেড়েছে। বর্তমানে ইসরাইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বৃহৎ মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ। অন্যদিকে, বুশের নীরব সমর্থনের কারণেই গত তিন বছরে সন্ত্রাস দমনের নামে ১৩২০ জন নিরীহ প্যালেস্টাইনকে হত্যা এবং ১৮০০০ জনকে পঙ্গু করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। প্রেসিডেন্ট বুশ নীরব থেকেছেন এর প্রতি। উপরন্তু ডারবানে বর্ণবাদবিরোধী জাতিসংঘ সম্মেলনে ইসরাইলের পক্ষে ভেটো দিয়েছেন। কুর্দি ও শিয়াদের হত্যার জন্য সাদ্দামের বিচার করেছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। কিন্তু শাবরা-শাতিলায় নিরীহ প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুকে হত্যার খলনায়ক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারনকে অভিহিত করেছেন 'শান্তিবাদী মানুষ' হিসেবে। সাদ্দামের কাছে পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র আছে এই মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছেন বুশ। অথচ ইসরাইলের কাছে ৬০০ পারমাণবিক বোমা ও রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ থাকার পরও বুশ নিশ্চুপ। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে বুশের মতো সন্ত্রাসকে নির্লজ্জ সমর্থন দিয়েছেন এমন শাসক আরেকটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বুশের শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা শুধু আরব বা মুসলিম দেশগুলোকে ক্ষুব্ধ করেছে তাই নয়, ইউরোপের মিত্ররাও এখন তার বিপক্ষে। ইরাকে আগ্রাসন নিয়ে এই বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছেছে। রাশিয়া তো বটেই; জার্মানি,

ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মতো এককালের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও বুশের ইরাক আক্রমণের একক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অনেকে অবশ্য বলছেন, এটা ট্রান্স-আটলান্টিক 'পারিবারিক মনোমালিন্য'। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। আমেরিকার যে কোনো সামরিক পদক্ষেপের ব্যাপারে ইউরোপে গণপ্রতিবাদ দেখা গেছে। যেমনটা দেখা গেছে '৮০-র দশকের গোড়াতে ইউরোপে মিসাইল মোতায়েনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে ইউরোপের বামপন্থীরা ছাড়া বাকিরা মার্কিনবিরোধী মনোভাব তেমন পোষণ করতো না। বিশেষত, যতদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিলো, ইউরোপের অধিকাংশ মানুষই যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে ছিলো।

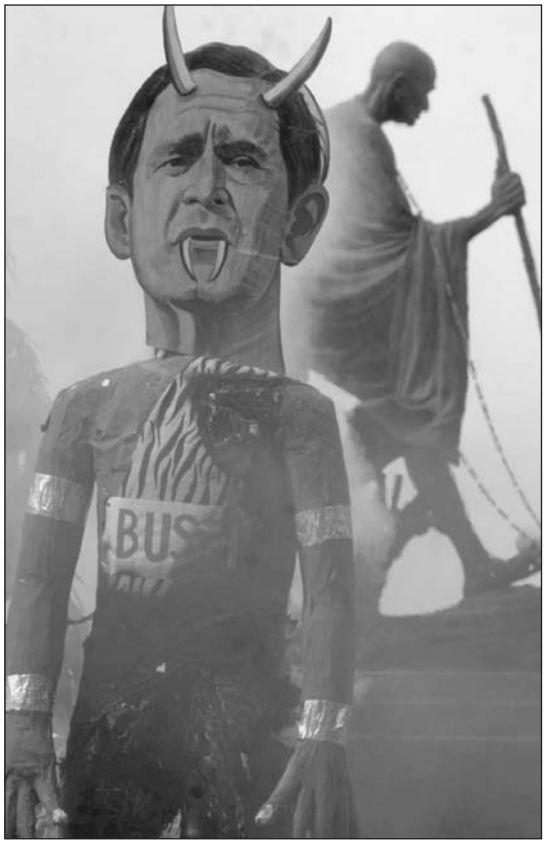

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বুশকে আনাড়ি বলা চলে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ সংকীর্ণ, রিপাবলিকানদের মধ্যে যেমনটা সচরাচর দেখা যায়। তার জ্ঞানেও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি চলাকালে একবার এক টিভি অনুষ্ঠানে তাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। বুশ বলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন

বুশের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইউরোপের মতো ঘনিষ্ঠ এবং পরীক্ষিত মিত্রকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। শুধু ইরাক যুদ্ধের কারণে এমনটা হয়েছে তা নয়, যুদ্ধের বেশ আগে গত বছরের মাঝামাঝিতে বুশ ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় একটা জনমত জরিপে দেখা যায়, ব্রিটেনের ৪৮ শতাংশ, ফ্রান্সের ৫১ শতাংশ, জার্মানির ৫০ শতাংশ এবং স্পেনের ৪৪ শতাংশ মানুষ প্রেসিডেন্ট বুশকে পছন্দ করে না। বিশ্লেষকরা ব্যাপারটি আমেরিকাবিরোধী না বলে বুশবিরোধী হিসেবে দেখেছেন। তারা বলছেন, ইউরোপ জুড়ে বুশের গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে। সামরিক বা অর্থনৈতিক কারণ নয়, বুশের ব্যক্তিগত ও আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির জন্যই এই তীব্র বুশবিরোধিতা।

ক্ষমতায় এসে বুশ ক্রমাগত ইউরোপীয় মিত্রদের উপেক্ষা করেছেন। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেননি। যুক্তরাষ্ট্র যে ইউরোপীয় দেশগুলোর চেয়ে সবদিক থেকে এগিয়ে আছে, নানাভাবে বুশ সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ১১ সেপ্টেম্বরের পর বুশ প্রশাসন আরো ভয়ানকভাবে একরোখা হয়ে ওঠে। বুশ প্রশাসন মিত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষে কোনো রকম ছাড় দিতে চাইছিলো না। এমনকি টুইন টাওয়ার আক্রমণের পর ন্যাটো ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আত্মরক্ষার ধারা কার্যকর করে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে আফগানিস্তানে হামলা চালায়। এভাবে ইউরোপের সহযোগিতা ও আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করতে থাকেন বুশ।

সর্বশেষ ইরাক যুদ্ধ নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে। জার্মানি, ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী ইউরোপীয় দেশগুলোর তীব্র যুদ্ধবিরোধিতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ইউরোপীয় দেশগুলো জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের মিশন সম্পন্ন করার পক্ষে থাকে। কিন্তু বুশ জাতিসংঘকে উপেক্ষা করেন প্রথম থেকেই। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরুর জন্য কেবল জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবের পক্ষে ছিলো। কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানির প্রচেষ্টায় ইরাক আক্রমণের আগে আরো একটি প্রস্তাব পাসের পক্ষে জাতিসংঘের অধিকাংশ দেশ অবস্থান নিলে বিরোধ চরমে পৌঁছে। বুশ জার্মানি, ফ্রান্সকে 'পুরনো ইউরোপের' ধ্যানধারণা এখনো ত্যাগ না করার জন্য ভর্ৎসনা করেন। ইউরোপের একমাত্র দেশ ব্রিটেন আমেরিকার পক্ষে থাকলেও বুশ ব্রিটেনকে ছাড়েননি। যুদ্ধের আগে তিনি ঘোষণা দেন, ব্রিটেনকে ছাড়া একাই যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত তার দেশ। ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশের সঙ্গে বুশের আচরণ এটাই প্রমাণ করে, কারো সৎপরামর্শ তিনি শুনতে নারাজ। গায়ের জোরে সমস্ত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবার ভয় থাকলেও তাতে বুশের দুশ্চিন্তা নেই। সমস্ত সংগঠন ও মিত্রদের সঙ্গে সমঝোতার নীতি পায়ে ঠেলে বুশ 'একলা চলো' নীতি নিয়েছেন। নিজেকে 'পৃথক' প্রমাণের চেষ্টা করছেন।

'পৃথক' তিনি হয়েছেন ঠিকই কিন্তু ভিন্নভাবে। ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট বুশের দুর্বৃত্ত স্বভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘের অনুমোদন লাভের সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় বুঝতে পেরে বুশ সাফ জানিয়ে দেন, ইরাক আক্রমণে সংস্থাটির অনুমোদন প্রয়োজন নেই। অথচ '৪৫ সালের জাতিসংঘ সনদে পরিষ্কার বলা আছে কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হলে জাতিসংঘের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু 'মাস্তান' বুশ সেই অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বিশ্বব্যাপী মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারের নেশা তাকে গ্যাংস্টারে পরিণত করেছে। পৃথিবীর অন্যকোনো রাষ্ট্রপ্রধান বুশের মতো বিশ্বজুড়ে এ রকম ত্রাস সৃষ্টি করেনি। ইরাকের পর বুশ চোখ ফেরাচ্ছেন সিরিয়ার দিকে। তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ইতিমধ্যে হুমকি দিয়েছেন, সিরিয়ার আচরণ অত্যন্ত খারাপ। তারা বাথ পার্টির পদস্থ কর্তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। এসব কথাবার্তা আর কিছুই না, আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতি মাত্র। এরপর ইরান, পাকিস্তান...। একনায়ক মুসোলিনী বলেছিলেন 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন।' প্রেসিডেন্ট বুশ মনে হচ্ছে এই মন্ত্রকেই জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। সন্ত্রাস দমনের নামে তিনি বিশ্বব্যাপী যেভাবে একটির পর একটি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সন্ত্রাসের আশঙ্কা কোনোক্রমেই কমছে না। উইনস্টন চার্চিল একবার মন্তব্য করেছিলেন 'সঠিক কাজটির জন্য আপনি আমেরিকার ওপর সব সময় নির্ভর করতে পারেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত এর বিকল্পগুলো শেষ হয়ে যায়।' বুশের কর্মকান্ড দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্ভবত তার বিকল্প ফুরিয়ে গেছে। আর এ কারণেই সন্ত্রাস ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।